বেজে ওঠে শঙ্খ....

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

ফয়েজ আহমদকে ডাকলেন তিনি। হঠাৎ যেন গোটা সামরিক এজলাস এক বজ্রকণ্ঠে প্রকম্পিত হলো। সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলো মেঘমন্দ্র গর্জনে।

'কি রে ফয়েজ, কথা ক'স না কেনো? শোন, আমার বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের কথা শুনতে হবে'। থতমত খেয়ে বিপর্যস্ত এজলাস। বিহ্বল দৃষ্টিতে বসে বিচারকেরা। সেদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেলো মামলার কার্যক্রম। এই হলেন আমাদের সাহসী নেতা।

আর একটি ঘটনা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের। সেই ঘটনার কথা লিখেছেন আর একজন। তিনিও বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য প্রয়াত খ্যাতিমান সাংবাদিক এম আর আক্তার মুকুল তাঁর 'মুজিবের রক্ত লাল' গ্রন্থে।

১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলজিয়ার্সের চতুর্থ জোট নিরেপেক্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, ফিদেল কাস্ত্রো, নরোদম সিহানুক, বাদশাহ ফয়সল, হুয়ারি বুমেদিন, আনোয়ার সাদত, আলেন্দে সমেত অনেক বিশ্বনেতা। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের চেষ্টায় সম্ভব হলো একটি অতিশয় দুরূহ সাক্ষাৎকার। সৌদির বাদশাহ ফয়সল এবং বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারটি ছিলো খুবই স্বল্পকালীন। সৌদিআরব বাংলাদেশকে তখনো স্বীকৃতি দেয়নি বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সর্বাংশে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ বিরোধীদের বিভিন্ন তৎপরতায় সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে যে কথাবার্তা হয়েছিলো দোভাষীর মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে, সেটা হুবহু তুলে ধরছি মুকুল ভাই-এর বর্ণিত গ্রন্থটিতে-

'... বাদশাহঃ এক্সেলেন্সি, আমি শুনেছি যে আসলে বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশী। কিন্তু কথা হচ্ছে আপনারা কোন ধরনের সাহায্য চান? দয়া করে বলুন আপনারা কী চান? অবশ্য এসব সাহায্য দেয়ার জন্যে আমাদের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে।

মুজিবঃ এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি নেবেন না। আমি হচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমার তো মনে হয় না, মিসকিনের মতো বাংলাদেশ আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে?

বাদশাহঃ তাহলে আপনারা কিংডম অফ সৌদি এরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাচ্ছেন?

মুজিবঃ বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবা শরীফে নামাজ আদায়ের অধিকার চাচ্ছে। এক্সেলেন্সি, আপনিই বলুন সেখানে তো কোনোও শর্ত থাকতে পারে না। আপনি সুমহান এবং প্রতিটি বাঙালি মুসলমান আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনি হচ্ছেন পবিত্র কাবা শরীফের হেফাজতকারী। এখানে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। সেখানে আবার শর্ত কেন? এক্সেলেন্সি, আপনাদের কাছ থেকে ভ্রাতৃসুলভ সম্মান ও ব্যবহার প্রত্যাশা করছি।

বাদশাহঃ এসব তো আর রাজনৈতিক কথাবার্তা হলো না। এক্সেলেন্সি, বলুন আপনারা কিংডম অফ সৌদি এরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাচ্ছেন?

মুজিবঃ এক্সেলেন্সি, আপনি জানেন এই দুনিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। তাই আমি জানতে চাচ্ছি, কেন সৌদিআরব আজও পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না?

বাদশাহঃ আমি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করি না। তবুও আপনি একজন মুসলমান, তাই বলছি সৌদি স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' করতে হবে।

মুজিবঃ এই শর্তটা কিন্তু অন্তত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ হলেও এই দেশে প্রায় এক কোটির মতো অমুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সবাই একই সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে হয় শরিক হয়েছে, না হয় দুর্ভোগ পোহায়েছে। তাছাড়া, এক্সেলেন্সি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তো শুধুমাত্র রাব্বুল মুসলেমিন নন – তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামিনও। তিনি তো শুধুমাত্র মুসলমানদের আল্লাহ নন, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র অধিকর্তা। এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি মাপ করবেন। আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি এরাবিয়া' নয়। এই মহান দেশের নাম আরব জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও রাজনীতিবিদ মরহুম বাদশাহ ইবনে সউদ-এর সম্মানে 'কিংডম অব সৌদি এরাবিয়া', কই আমরা তো এই নামে কোনো আপত্তি করিনি?

বাদশাহঃ এছাড়া আমার অন্য একটা শর্ত রয়েছে এবং তা হচ্ছে অবিলম্বে সমস্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে।

মুজিবঃ এটা তো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। দুটো দেশের মধ্যে এ ধরনের আরও অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে; যেমন ধরুন বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ পাকিস্তানি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নেয়া, বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা- এই ধরনের বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। এসবের মীমাংসা কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই শুধুমাত্র একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নটি পৃথকভাবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। আর এজন্য সৌদি আরবই বা এতো উদগ্রীব কেন?

বাদশাহঃ এক্সেলেন্সি, শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন, সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। তাহলে এক্সেলেন্সি, আর তো কথা থাকতে পারে না। তবে আমাদের দুটো শর্তের বিষয় চিন্তা করে দেখবেন। একটা হচ্ছে ইসলাম প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা, আর একটা বিনা শর্তে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি। আশাকরি বাংলাদেশের জন্যে সাহায্যের কমতি হবে না।

মুজিবঃ প্রায় দু'বছর পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় সেখানকার পরহেজগার মুসলমানরা যে পবিত্র হজ্ব আদায় করতে পারছেন না, সেই কথা ভেবে দেখেছেন কি এক্সেলেন্সি? এভাবে বাধার সৃষ্টি করা কি জায়েজ হচ্ছে? পবিত্র কাবা শরীফে তো দুনিয়ার সমস্ত দেশের মুসলমানদের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। তাহলে কেন এই বাধার সৃষ্টি? কেন আজ হাজার হাজার বাঙালি পরহেজগার মুসলমানকে ভারতের পাসপোর্টে হজ্ব আদায় করতে হচ্ছে? আকস্মিকভাবে এখানেই আলোচনার পরিসমাপ্তি...'।

এম আর আক্তার মুকুল এরপরে লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর তৎকালীন নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর উচ্চারিত একটা আরবি কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, লা-কুম-দ্বিন-কুম-ওয়ালি ইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার)।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সে সময় নীতির প্রশ্নে, দেশের প্রশ্নে, যুদ্ধবন্দিদের কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতটুকু অনমনীয় এবং আপসহীন ছিলেন। এই সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পরপরই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষের কাছে। রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় তিনি বিরোধী পক্ষের মত প্রকাশের অধিকারকেও সব সময় সর্বোচ্চ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি তাঁর শত্রুকেও শ্রদ্ধা করতেন এবং তার মতপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং আদর্শ। সারাজীবন তিনি মানুষকে ভালোবেসে তাঁর সমগ্র জীবন উজাড় করে দিয়েছেন। কি পরিমাণ ভালোবাসতেন মানুষকে বোঝা যায় তাঁর এই কথায়, 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালবাসি'।

আজ মনে পরে তিনি বলেছিলেন, 'রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব!' প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো'। জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়েই মানুষের ভালোবাসার ঋণ তিনি শোধ করেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশি বিদেশি চক্রান্তের রোষে তাঁকে জীবন দিতে হয়। পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সরকারগুলোর ভূমিকা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর কার্যক্রম থেকে আজ আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নষ্ট রাজনীতির প্রবর্তন, লালন, পরিচর্যার পেছনে কারা অদ্যাবধি সক্রিয়। আমরা এখনও দেখি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের মধ্যেও এদেশের মানুষ চালিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের অভিযাত্রা।

আমরা আজ সেই সময় পেরিয়ে এসেছি। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এই নিগড় থেকে মুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতনই একইভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী অপশক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

আজ এই মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ❑

লেখক : সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক জাগরণ।

ডিএফপি নং ০৯ - ১৬/০৩/২০২১

পুনশ্চ মুজিবকথা

নির্মলেন্দু গুণ

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় আকাশের চাঁদ
যেরকম গ্রহণগ্রস্ত মানুষের দৃষ্টিকে দখল করে, তিনিও ঠিক
তেমনি, এই বঙ্গীয় বদ্বীবাসীর দৃষ্টিকে দখল করেছিলেন;
আর নিজেকে পরিণত করেছিলেন জন্মভূমির নয়নমণিতে।

সূর্যমুখী যেমন সর্বদা সূর্যের দিকে স্থির করে রাখে তার মুখ,
অথবা প্রথম প্রেমে-পড়া তরুণ প্রেমিক যেরকম তার
প্রেমিকা-বিগ্রহে অপলক চোখে মগ্ন রহে, তিনিও ঐ রকমই
তাঁর জন্মভূমির রুগণ-পাণ্ডুর মুখের ভিতরে তাকিয়ে ছিলেন।

তিনি বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথবৎ,
তিনি এই ভূখণ্ডবাসীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন নজরুলবৎ,
তিনি বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জীবনানন্দবৎ।
তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ মুখশ্রী,
তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো-'আমার সোনার বাংলা'-;
তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো মুক্তিস্বপ্ন, প্রিয় স্বাধীনতা।

তিনি তাঁর দেশকে ভালবেসেছিলেন হো চি মিনের মতো,
তিনি তাঁর জন্মভূমিকে ভালবেসেছিলেন লেনিনের মতো,
তাই বন্দি ভূখণ্ডবাসীর অশ্রুতে দ্রব হয়েছিল তাঁর হৃদয়।
তাই তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি-বিস্ফোরণে দ্রুত খসে পড়েছিলো
ধর্মীয় ঘোমটার আড়ালে লুকানো ছদ্মস্বাধীনতার মুখোশ।
তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো মাতৃভূমির কলোনিকালিমা।

তাঁর দেশপ্রেম ছিলো প্রশ্নাতীত, তিনি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন,
তাঁর জাগতিক অস্তিত্বই ছিলো স্বাধীনতার অনন্ত ঘোষণা।

জন্ম যদি তব বঙ্গে

জাফর ওয়াজেদ

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় চৈত্রদিনের গান, বসন্তকালের আলো-হাওয়া প্রবাহিত তখন, আর এরই মাঝে আবির্ভূত হলেন বাংলার সহস্র বর্ষের সাধনার নাম- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাধিত সেই ধন্য পুরুষের জন্মশতবর্ষে বাঙালি জাতি নতুন উদ্দীপনায় তাঁরই নির্দেশিত পথে মুক্তির রথে চলেছে এগিয়ে। জাতি পালন করছে তার পিতার জন্মশতবর্ষ, মুজিববর্ষ। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি পালিত হয় জাতীয় শিশু-কিশোর দিবস হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু শুধু একটি নাম নন, হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম। ন্যায়, সত্য, কল্যাণ এবং আত্মমুক্তির পক্ষে সোচ্চার উদার হৃদয় মহান মানুষ। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। বাঙালিত্ব ছিল তাঁর অহংকার। এই বাঙালিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতায়। কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছার অনিন্দ্য কুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বাঙালি জাতি। সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। জাতির শাণিত শিরায় অকুতোভয় সাহস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দুঃসময়, হতাশার সব বাধার দেওয়াল ভেঙে দীর্ঘ পরাজিত, শোষিত, বঞ্চিত জাতিকে স্বাধীনতার সূর্যস্নানে স্নাত করিয়েছেন। তাই তো প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উচ্চারিত হয় ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় সিক্ত একটি নাম– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অসমাপ্ত সেই জীবনী। ঘাতকের উদ্যত সঙ্গিন সেই রচনা সমাপ্ত হতে দেয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের দেশি-বিদেশি এজেন্টরা বাঙালিত্বের চেতনা এবং স্বাধীনতার সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর আঘাত হানে। তাঁকে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট দস্যুর মতো রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অবস্থায় পরিজনসহ হত্যা করা হয়েছিল। এ যে জাতির জন্য কত বড়ো গ্লানি, অপমান ও লজ্জার কথা; তা অবর্ণনীয়। ইতিহাসের চাকা, সভ্যতার চাকাকে নিষ্পেষিত করে ঘাতকরা বাঙালি জাতির জীবনে সৃষ্টি করেছিল ট্র্যাজেডি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে ছিলেন তিনি এককভাবে অগ্রসরমান। সবাইকে পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন একটি পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটি সম্পাদনে। একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা– সবকিছুই সম্ভব হয়েছে একক নেতৃত্বে। আর এই যুগান্তকারী কালজয়ী নেতাই হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি যাকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দিয়ে সম্মানিত-সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের। জাতি জানে, এসব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। ছিলেন দূরদর্শী, দুঃসাহসী, আপসহীন। সততা, কর্মনিষ্ঠতা, কর্মকুশলতা– সবকিছু মিলিয়ে এক অতুলনীয় মানবে পরিণত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির জীবনে আপন দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। সহস্র বছরের সাধনা শেষে বাঙালি জাতি পেয়েছে তার মহানায়ককে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। নিরন্ন, দুঃখী, অভাবী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জাতির দুর্ভোগ মোচনে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে অগ্রসেনানীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দাঙ্গাপীড়িত বাঙালি-অবাঙালিকে রক্ষায় জীবনবাজি রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। লোভ-মোহের উর্ধ্বে ছিলেন বলেই শাসকের নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে দুঃসাহসে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী হয়েছেন। দিনের পর দিন কেটেছে কারাগারে। লৌহকপাটের অন্তরালে কখনো ভেঙে পড়েননি। হতাশা গ্রাস করেনি। শাসকদের সমঝোতার পথকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ইত্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন শেষদিন পর্যন্ত। ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের উত্তাপ বঙ্গবন্ধু ধারণ করতেন। তাই জাতিকে নিজের মতো করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাজার বছর ধরে পরাধীন-পর্যুদস্ত থেকে থেকে যে জাতিটি আধমরা থেকে পুরো মরায় পরিণত হচ্ছিল ক্রমশ; বজ্রহুংকারে শুধু নয়, আদরে-সোহাগে প্রাণের প্রবাহে স্পন্দন তুলে একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবন থেকেই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন। তাই জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত ছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন পাঠ করেছেন। কারাগারের জীবনে এবং পাকিস্তানি কারাগারে একাত্তরের ৯ মাস বন্দিজীবনকালে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু কখনই ধর্মান্ধ ছিলেন না। তাই ইংরেজি ভাষা ছাত্রজীবনেই চর্চা করেছেন। এ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলেই এবং মেধাবী হিসেবে সেসময়ের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। আইন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালেই বহিষ্কৃত হন। অপরাধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন দান।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'নেতাজি সুভাষ বোসের' সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থানীয় জনগণের সমস্যা সমাধানের দাবিতে তিনি যখন অগ্রসরমাণ, তখন রাজনৈতিক গন্ডির পরিধিতে ক্রমশ প্রবিষ্ট হতে থাকেন। গোপালগঞ্জে পড়াকালে যে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হয়েছিল, কলকাতায় তা আরও প্রসারিত হয়। সেখানে ছাত্র আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলে। সাহস ও যোগ্যতায় তিনি সমকালীন অনেককে ডিঙ্গিয়ে পাদপীঠে চলে আসেন। তখনকার সময়ের রাজনীতিতে শেখ মুজিব তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা শাসনক্ষমতায় সর্বত্র। স্পষ্ট হয় যে, এক ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানি বেনিয়া শোষকদের হাতে পড়েছে বাঙালি। রাষ্ট্রক্ষমতার কোথাও বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি নিজেদের শাসন করার অধিকারটুকুও পাকিস্তানি শাসকরা কব্জা করে রেখেছে। উপলব্ধি হলো, পূর্ববঙ্গবাসী দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান– মানুষ এই মৌলিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত। পূর্ববঙ্গের কৃষকের উৎপাদিত পাটসহ অন্যান্য পণ্য বিদেশে রফতানি করে যে আয় হয়, তার পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ব্যয় হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবন আরেক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার উৎসগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষ অনুভব করে যে, পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ বানানো হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহমুক্তি ঘটতে শেখ মুজিবের সময় লাগেনি। তাই মুসলিম লীগ বিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন একজন নেতারূপে দেখা দিলেন শেখ মুজিব। গড়ে তুললেন শক্তিশালী বিরোধী দল। বইয়ে দিলেন দেশজুড়ে আন্দোলনের জোয়ার। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে মুসলিম লীগ যে পন্থা নিয়েছে, শেখ মুজিবসহ অন্য নেতারা এর বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিব ক্রমশ পূর্ববঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব ও সংগঠন সংহত করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বললেন। তিনি উপস্থাপন করলেন ছয় দফা। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসক তার জবাব দিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করে। এতেই আগুনে ঘি পড়ল। পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবকেই একমাত্র স্বার্থরক্ষক হিসেবে দেখলেন। ছাত্ররা ছয় দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে নামে আন্দোলনে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং হলেন বঙ্গবন্ধু। অর্থাৎ বাংলার বন্ধু।

বঙ্গবন্ধু বুঝতেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর বসবাস সম্ভব নয়। জোড়াতালি দিলেও মেলানো যাবে না। সুতরাং, ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক দফা ঘোষণা করলেন এবং তা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। সারাদেশ গর্জে উঠল সেই ডাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে গেল 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি। উঠে এলো 'বাংলাদেশ' নামক একটি নতুন

কবিদের কবি তুমি

মিনার মনসুর

কত কবি হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব আর
কত যে কবিতা তারা লেখে– কী বিচিত্র তার ভাষা ও সংকেত!
মাটির এমন গুণ এখানে সবাই কবি; যদি
বিশ্বাস না হয় তবে বৃক্ষকে শুধাও। এই দেশে
গাছেরা কবিতা লেখে বীজের ভাষায়; মাছ লেখে
জলকাব্য–ভাষা তার অন্যদের বোধের অতীত।
যে-নাঙ্গা সন্ন্যাসী আজও দীপ্র রয়েছেন বসে সম্রাট মৌর্যের
দরবার আলো করে তিনিও মহান কবি এক এ-বঙ্গের।
আর বিক্রমপুরের ওই যে শ্রমণভিক্ষাপাত্র হাতে নগ্ন পায়ে যিনি
অবিরাম চলেছেন ছুটেকালের প্রাচীর ভেঙে
দুর্গম পাহাড়ও আজ জপ করে অবিনাশী পঙ্‌ক্তিমালা তার।

পকেট গড়ের মাঠ দীর্ণ বুক–হাতে হাতে পরশপাথর
লালন হাছন রবি– নিমগ্ন থাকুন তারা নিজস্ব মোকামে
জীবনানন্দ দুদণ্ড শান্তি পাক বীরবাহু নির্মলার ধূসর আশ্রমে!
ঋতুরাজ বসন্তকে দেখো কী চমৎকার লিখে যাচ্ছে কবিতা নিভৃতে
কী যে তার রূপছটা রঙের বাহার!
বৃক্ষদের পাখিদের ফুলেদের মুখে মুখে মুহূর্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে
তার অলৌকিক আভা! আর দেখো ধ্যানমগ্ন ভোরের আকাশ
বাতাসে বাতাসে গীত হচ্ছে তার কবিতার অপূর্ব সুঘ্রাণ
অথচ কোথাও কোনো কোলাহল নেই।

তেরশত নদ-নদী জন্মাবধি নিরন্তর লিখে যাচ্ছে অজস্র কবিতা;
তারাই তো আদি কবি এ বাংলার! শুনে তুমি হাসো–
হাসবেই তো! পঞ্চাশেই তুমি হট্টগোল বিশ্বজুড়ে–
শতবর্ষে কি-না জানি হয়! নদী তবু নির্বিকার
বাংলার বিস্তৃত শস্যক্ষেত জুড়ে তার কবিতার খাতাখানি
ভরে আছে বহুবর্ণ কবিতা ফসলে। আর ঐ যে মানুষটি
তুমি যাকে গেঁয়ো চাষা বলে ডাকো–চর্যার চেয়েও
আদিতম তার কাব্যকীর্তি। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবারে
যে-বস্ত্র বইয়ে দিত মহার্ঘ উল্লাস তারও নির্মাতা
বাংলার অখ্যাত কোনো কবি।

ছবি, হায়, শুধু ছবি! অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাসে ভরা
যত অধরা মাধুরী! জল-হাওয়া-মাটির এত যে সাধনা
হাজার বছর ধরে ব্যর্থ অপেক্ষার এত যে প্রহর গোনা
এত যে মায়ের অশ্রু এত বীরের শোণিতধারা
সবই কি বিফলে যাবে তবে?–ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ
শুধান সক্রোধে; ঠিক তখনই সমুদ্রের বিপুল গর্জনে
তখনই অলৌকিক এক অঙ্গুলি হেলনে
লেখা হয়ে যায় সেই অমর কবিতাখানি আর অন্তহীন
রাত্রির তপস্যা শেষে রবিকরোজ্জ্বল দিন সসম্ভ্রমে বলে:
কবিদের কবি তুমি–বঙ্গপিতা–তোমাকে প্রণাম।

রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে পুরো জাতি যে একটি বিন্দুতে এসে স্থির-প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে স্বাধীনতা। পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে ততদিনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পশ্চিমা সংবাদপত্রে বলা হলো 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার কণ্ঠস্বর। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি পুরো জাতিকে তাঁর স্বাধীনতার জন্য করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। এমন পূর্বাভাসও দিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তবে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঙালি নীরবে আক্রমণ মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধু 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তোলার জন্য বলেছিলেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব। পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

স্বাধীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নাজুকই ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্ত্রের ব্যবহার নাগরিক সমাজকে বদলে দিয়েছিল। রাজনীতির ধরনটাই পালটে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এবং পরিণামে সবকিছুর মূল্য বেড়ে গেল। দেশের প্রধান রফতানি পণ্য পাটের চাহিদা কমে গেছে। মানুষের প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ তখন ঘটছিল না। দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাংলাদেশকে ঘিরে। বামপন্থি ও দক্ষিণপন্থিরা আদাজল খেয়ে লাগল। পরস্পরবিরোধী দাবিতে রাজপথ মুখর হতে থাকল। কেউ চায় পাকিস্তানি সেনাদের বিচার, কেউ চায় পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। কেউ চায় ঘাতক-দালালদের বিচার। আবার দালাল আইন প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন করবেন বলে স্বয়ং মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্ত বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী, তা জনগণকে বোঝানো হয়নি। ছাত্রদের একটি অংশ 'গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তারা থানা লুট, ফাঁড়ি লুট, পাট ও খাদ্যের গুদামে আগুন দেওয়াসহ নাশকতামূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। অনেক স্থানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিদের দোসর আলবদর ও রাজাকাররা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারাও বিদেশ থেকে বাংলাদেশবিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে। নানামুখী

ষড়যন্ত্রের মুখে বঙ্গবন্ধু দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র রক্ষায় একটি মহৎ প্রকল্প নেন। তিনি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধেরও ডাক দেন। সর্বহারা পার্টি নামে পাকিস্তানপন্থি দলগুলো এবং তাদের দোসর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছিল। এই অরাজকতা, ধ্বংস, হানাহানির বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। যারা তাঁকে হত্যা করেছিল, তারা পাকিস্তানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। তাই যে তাজউদ্দীন আহমদ এক বছর আগে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সেই তাঁকেও ঘাতকরা রেহাই দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আরও তিন জাতীয় নেতার সঙ্গে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকেও জেলখানায় হত্যা করেছিল। পাকিস্তান অভিনন্দন জানিয়েছিল 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া পঁচাত্তর সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতা দখল করার পর খুনি মোশতাকের ধারায় দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ নেয়। তিনি একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার কাজটি করেন। এরা শাসনক্ষমতায় বসে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে যায়। স্বাধীনতার ইতিহাস, মূলনীতি বিকৃত করা হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলাই শুধু নয়, শেখ মুজিবের নামও মুছে ফেলার চেষ্টা চলে। কিন্তু ইতিহাসের পাতাজুড়ে শেখ মুজিবের নাম জ্বলজ্বল করে। সবকিছু ছাপিয়ে এই একুশ শতকেও আছেন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য দিক-নির্দেশনা নিয়ে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতি শেখ মুজিব হত্যার বিচার পেয়েছে। পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। জেলহত্যার বিচারও হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি ছিলেন সৎ। তাঁর সততা ছিল বাঙালির প্রতি, বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি, বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি। তিনি লড়াই করেছেন সাহসের সঙ্গে। গুলি বঙ্গবন্ধুর বুকেই লেগেছিল, পিঠে নয়। বার বার ফিরে পায় আজও বাঙালি তার জাতির পিতাকে। জন্মশতবর্ষে জাতি নতুনের আহ্বানে গাইছে গান। ❑

লেখকঃ একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা

মুহাম্মদ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নানা জনের ভূমিকা বা অবদান স্বীকার করে নিয়েই ইতিহাসে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বস্তুত ১৯৪৮ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বাঙালিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানান আন্দোলন-সংগ্রামে সামনের কাতারে থেকে দুঃসাহসী ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের যাদুকরী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯৬৬ সালে বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ হিসেবে তাঁর ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের মানুষের মনে যতই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুও ততই মুক্তির দিশারি হিসেবে মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পেতে থাকেন। নানা বাধা-বিপত্তি, অপপ্রচার, বিশেষ করে কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় তাঁকে জড়িয়ে স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার সরকারি নীলনকশা উড়িয়ে দিয়ে ছাত্র-জনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু তথা বাংলার বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করেন। ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগের প্রতি নিরঙ্কুশ জনরায় তাঁকে বাংলার অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। বঙ্গবন্ধুর হাতে পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ৩ মার্চ পল্টনে আয়োজিত বিশাল সমাবেশেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ও জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে মাওলানা ভাসানীর সমর্থন দানের ঘোষণা, ৭০ এর নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সভায় যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ–এসব কিছু মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার কিংবা দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর ক্ষমতাসীন সরকার সমকালীন প্রজন্মের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস গোপন করে বিকৃত তথ্য তুলে ধরতে থাকে। বই-পত্রে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' অংশে বঙ্গবন্ধুর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাগুলোকে এমনভাবে আড়াল করা হয় যাতে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে জাতির একজন নেতা ছিলেন তাও সমকালীন বা পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে না পারে। ওই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক শক্তি ধর্মীয় প্রচারণার আড়ালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং পর্যায়ক্রমে সরকারি-আধাসরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে নেয়। তারা কথায় কথায় আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটাতে থাকে। এর ফলে পঁচাত্তর পরবর্তী অন্তত দুই দশকের বেশি সময় ধরে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উল্লেখযোগ্য অংশ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে বেড়ে উঠেছে মানসিকভাবে – তাদের অনেকে বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে ইতিহাস তার নির্ধারিত পথে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব কতটুকু নিরঙ্কুশ এবং তিনি কেন জাতির পিতার মর্যাদার অধিকারী তা উপলব্ধি করতে হলে তাঁকে মূল্যায়ন করে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মন্তব্য জানা নতুন প্রজন্মের জন্য জরুরি। কয়েকজনের মন্তব্য তুলে ধরছি।

'ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক ছিলেন সেদেশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ সুকর্ণ। সেখানে সুকর্ণকে উৎখাত করে জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতায় বসেন। সে সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় কেউ সে দেশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ সুকর্ণের নাম উল্লেখ করতে পারেনি। তবে সুকর্ণই যে ইন্দোনেশিয়ার জাতির জনক সে কথা সুহার্তো সরকার কোনো দিন অস্বীকার করেনি। অথচ আমাদের দেশে যে জিয়াউর রহমান ১৯৭২ সালে তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেই জিয়ার শাসনামলে স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে চাপা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের ক্রোড়পত্রসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনায় আমাদের শত্রুদের কথা উল্লেখ থাকলেও কখনোই জাতিকে জানানো হতো না যে সেই শত্রুবাহিনী কোন দেশ থেকে এসেছিল। বলা হতো হানাদার বাহিনীর কথা, কিন্তু 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা হতো না।'

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসন থেকে আলাদা হয়ে এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয় ১৭৭৬ সালে ২ জুলাই। ৪ জুলাই টমাস জেফারসন প্রণীত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসে অনুমোদিত হয় এবং ওইদিনই যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস পালন করে যদিও ওয়াশিংটনের জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় ১৯ জুলাই এবং পরবর্তী কয়েক দিনে।

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব রীতি অনুসারে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই তোলেন। এই অধিকার অন্য কারও নেই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি। টমাস জেফারসন ঘোষণাটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জন হ্যানকক ঘোষণাটি স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই নেতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু টমাস জেফারসন কিংবা জন হ্যানকককে যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করা হয় না।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তাই বলে তিনি পাক-ভারতে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃত নন কিংবা তাঁকে কেউ মহাত্মা গান্ধী কিংবা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমতুল্য বলে দাবি করেন না। একইভাবে রাশিয়ার লেনিন, চীনে মাও সে তুং এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে অন্যদের তুলনা করা হয় না।

'কোনো দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এখানে অপরিহার্য। মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন এই দাবি ঐতিহাসিক পটভূমিতে অবাস্তব এবং অগ্রহণযোগ্য। যারা এই দাবি করেন তারা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করেন না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে একটি বাণী পাঠককে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড় করাবার অপচেষ্টা বাণী পাঠককে মহিমান্বিত করবে না; বরং পাঠক হিসেবে প্রাপ্য সম্মান থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করবে'।

'বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অস্বীকার করা সংবিধান লঙ্ঘন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। একে শুধু সংবিধানের অংশ বললে খাটো করে দেখা হবে। মূলত, ঘোষণাপত্রকে অস্বীকার করা স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করার সামিল। ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে লেখা আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। এই ঘোষণা অস্বীকার করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অবমাননার তুল্য। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ'।

'কেউ বলেন, তিনি (বঙ্গবন্ধু) স্বাধীনতা চাননি–কেউ বলেন, তিনি বাংলাদেশ চাননি–কেউ বলেন, তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কেউ বলেন, তিনি পতাকা উড়াননি। কেউ বলেন, তিনি পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এর জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর জবাব একটি। ২৬ মার্চ রাতে রেডিও মারফত ইয়াহিয়া সাহেব যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে শুধু একটি নামই ছিলো, সেই নাম শেখ মুজিব। কত লোক স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন, কত লোক পতাকা উড়িয়েছেন কত লোক প্রাণ দিয়েছেন, কত লোক দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, নাম কারো আসেনি ইতিহাসের পাতায়। নরাধম ইয়াহিয়ার খাতায় একটি নামই ছিলো, "মুজিব, ইজ এ ট্রেইটর টু দ্য নেশন, দিজ টাইম হি উইল নট গো আনপানিসড"। জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে, যে মানুষ কিছুই করলো না, স্বাধীনতা ঘোষণা করলো না, বাংলাদেশ চাইলো না, পতাকা উড়ালো না, তাঁর ওপর তোমাদের কেনো এতো রাগ? আমরা এতো কিছুই করলাম, আমাদের নাম তো তোমাদের খাতায় উঠলো না। ...বিন্দু থেকে বিন্দুর যে অস্তিত্বের মধ্যে মানুষের জীবন, এই অস্তিত্বের মধ্যে শেখ মুজিব একটি স্ফুলিঙ্গের মতো জন্মেছিলেন।'

বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের প্রয়াত সদস্য এম এম রেজাউল করিমের মতে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে এবং তাঁর পক্ষ হয়েই স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমি কেমন করে বঙ্গবন্ধুকে প্রশংসা করে কাগজে লিখি। এতে সংশয়, অবিশ্বাস জন্মাতে পারে আমার প্রতি। আমার উত্তর ছিল সহজ। যা বর্ণনা করা হয়েছে এসবগুলোই ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। সত্য আজ না হোক কাল উদঘাটিত হবেই। এটা সময়সাপেক্ষ। এ ছাড়াও, এমন কি রাজনীতির পক্ষেও সত্য সুন্দর হওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে বৈকি! আর এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই যে, যাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাথায় রেখেই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং এসব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও, যিনি বঙ্গবন্ধুর নামে এবং তাঁর পক্ষ হয়েই স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেছিলেন।'

মূলত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাত্রার শুরু থেকেই বাঙালিদের প্রতি শাসন শোষণের ব্যাপারে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান, বিশেষ করে মুসলিম লীগের তৎকালীন নেতাদের বড়ো অংশের ক্ষমতালিপ্সা ও আপসকামী মনোভাবও জানা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তিনি বুঝেছিলেন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অধীনে থেকে স্বাধীন, সমৃদ্ধশালী আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালিরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তখন থেকেই বাংলার মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। আট চল্লিশের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আন্দোলন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে কারাগারে অনশন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ৫৪তে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপান্তর, সাতান্নতে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দলের হাল ধরা, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের গণবিরোধী সকল কাজ ও নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ও সাহসের সঙ্গে কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোকাবিলা এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ী করার মধ্যদিয়ে বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এরপর একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান সংবলিত ভাষণ দিয়ে জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং ২৫ মার্চ আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেন তিনি। যুদ্ধের নয়মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর আহ্বান ও নেতৃত্বকে মাথায় নিয়েই তাঁর সহকর্মীরা ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাকে পরাজিত করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তবে এই বিজয় অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল নেতা মুজিবের অনুপস্থিতিতে। অবশেষে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন জনতার নেতা মুজিবর। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একটি স্বাধীন দেশ 'বাংলাদেশ' ও বাঙালিদের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব যাঁর তিনিই তো জাতির পিতা। মানুষের মনের পাশাপাশি দেশের সংবিধানেও স্বীকৃত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ❑

লেখক : সাংবাদিক, গবেষক।